ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 58-67
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.434

খেতুরি মহোৎসব পরবর্তী সময়ে বঙ্গে বৈষ্ণব-সংস্কৃতি

ড. অনুপমা করণ, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The article explores the historical and cultural significance of the Kheturi Mahotsav, organized by Narottam Das Thakur in 1582 at Kheturi village in present-day Rajshahi. Narottam, after studying devotional scriptures under Jiva Goswami in Vrindavan, returned to Kheturi and established shrines to Krishna, Radha, and Chaitanya. To mark these installations, he invited all branches of the Vaishnava community, creating what became the first large-scale Vaishnava assembly in Bengal. Despite initial doubts from Srinivas Acharya about the feasibility of such a grand event, the festival drew unprecedented participation, including leading Goswamis, Mahantas, and devotees from across Bengal. The Mahotsav was notable for its inclusivity. Invitations were extended universally, disregarding caste or sectarian divisions. Eminent figures such as Jahnava Devi, Vishnupriya Devi, and Achyutananda, son of Advaita Acharya, attended, lending immense prestige. The event symbolized Bengal's first 'national conference', breaking social barriers by welcoming Brahmins, Kayasthas, Vaidyas, Shudras, and even Muslims into the Vaishnava fold. Raja Santosh Dutta provided hospitality, while Narottam's revolutionary stance challenged Brahmanical orthodoxy by accepting Brahmin disciples despite his Kayastha origin. This sparked controversy but ultimately broadened Vaishnavism's social base. The Mahotsav also marked a cultural turning point. It restructured kirtan traditions, incorporating elements of North Indian classical music such as dhrupad and khayal. Narottam's musical expertise helped systematize devotional singing, shaping the future of Bengali Vaishnava culture. In the aftermath, Gaudiya Vaishnavism spread widely across Bengal. Marginalized groups, including Shudras and Muslims, found dignity and inclusion through initiation by Goswamis. Practices such as accepting food from lower-caste disciples further eroded rigid caste hierarchies. Though internal conflicts between Vrindavan Goswamis and Bengal's sects persisted, the Kheturi Mahotsav became a landmark in religious and social transformation. It symbolized both the consolidation of Gaudiya Vaishnavism and the democratization of spiritual practice in Bengal.

Keywords: Boishnav, Kheturi, Chaitanya, Narottama Das, Jahnaba Devi, Birbhadra, Srinivas, Narahari Sarkar

রাজশাহী জেলার গড়েরহাট পরগনার একটি সমৃদ্ধ গ্রাম খেতুরি। নরোত্তম দাস এখানকার জমিদার কৃষ্ণদাসের পুত্র ছিলেন। তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়ে বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে খেতুরিতে ফিরে এসে সাধন-কুটির নির্মাণ করে অবস্থান করেন। নরোত্তম দাস তাঁর আশ্রমে

শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত, রাধারমণ, বল্লভীকান্ত এবং মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমস্ত গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি মহোৎসবের আয়োজন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সমস্ত শ্রেণির ভক্ত-মহান্তেরা এই মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। এই উৎসব খেতুরি মহোৎসব নামে বিখ্যাত। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন মাসে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই মহোৎসব পূর্ব পরিকল্পিত। "খেতুরি মহোৎসবের পরিকল্পনা বুধরিতে বসেই স্থির হল, রামচন্দ্রালয়ে।"[১]

খেতুরির মহোৎসবের ব্যাপারে নরোত্তম দাস ঠাকুরের পরিকল্পনা ঠিক কেমন ছিল তার বিস্তৃত বিবরণ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে নরোত্তম যখন এই মহোৎসবের পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন, তারপর খুব বেশি হলে মাস দেড়েক সময় তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিরাট উৎসবের বিপুল আয়োজন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সম্ভবত নরোত্তমের সুপরিকল্পিত অধ্যবসায় এবং প্রস্তুতি তার অনেক আগে থেকেই চলছিল। এমন মহোৎসবের সাফল্যের ব্যাপারে শ্রীনিবাস আচার্যের মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল। খেতুরিতে শুধুমাত্র মন্দির এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হলে চিন্তার কিছুমাত্র কারণ থাকত না। নরোত্তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং খেতুরি মহোৎসবের পরিকল্পনার ব্যাপারে কথাবার্তা হওয়ার পর শ্রীনিবাস এতটাই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, সেই রাতে তিনি ঘুমাতেই পারেননি। 'ভক্তিরত্নাকর'-এর কবি জানিয়েছেন:

"শ্রীআচার্য্য ঠাকুরে শয়ন নাহি ভায়।
কৈছে কার্য্য সমাধান হবে এ চিন্তায়।।
মনে মনে কহে মহাপ্রভুর প্রিয়গণ।
খেতরী গ্রামে কি করিবেন আগমন।।
অভিলাষ পূর্ণ কি করিব গৌররায়।
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়।।"[২]

মহাপ্রভুর স্বপ্নদর্শন করেন শ্রীনিবাস সেই রাতে। প্রভু তাঁকে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি মহোৎসবের প্রস্তুতির দিকনির্দেশ করেন এবং অনিবার্য সাফল্যের ইঙ্গিতটুকুও জানিয়ে যান:

"ওহে শ্রীনিবাস কিছু চিন্তা না করিবে।
নিমন্ত্রণপত্রী শীঘ্র সর্ব্বত্র পাঠাবে।।
যদ্যপি সে সকলের ব্যাকুল হৃদয়।
এথা আসিতেই হবে মহাহর্ষোদয়।।
দেখিবে সাক্ষাতে মোর অদ্ভুত বিলাস।
পাবে মহানন্দ পূর্ণ হবে অভিলাষ।।
অনায়াসে সর্ব্বকার্য্য হবে সমাধান।
এত কহি মহাপ্রভু হৈলা অন্তর্ধান।।"[৩]

শ্রীনিবাস আচার্যের চিন্তার কারণ সহজেই অনুমেয়। শ্রীখণ্ড বা কাটোয়াতে এরকম অনুষ্ঠান করতে হলে সহজেই বিভিন্ন বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু খেতুরির দূরত্ব সেকালের বিচারে যথেষ্ট বেশি হওয়ায় বয়োবৃদ্ধ মহান্ত-সহ সকল বৈষ্ণবের আগমন বেশ ভাবনার ব্যাপার। তাছাড়া তখন পর্যন্ত খেতুরিতে বৈষ্ণব প্রভাব ব্যাপক না হওয়ায় গোঁড়া বৈষ্ণবেরা উপস্থিত হবেন কিনা সে ভাবনাও আচার্যের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল। চৈতন্য পরিকরদের তিরোধান মহোৎসবে বিনা বাক্যব্যয়ে মহান্ত এবং তাঁদের শিষ্যেরা উপস্থিত হন। সেখানে অন্তরের তাগিদ থাকে। কিন্তু খেতুরির ক্ষেত্রে সেরকম তাগিদের দিকটিও অনুপস্থিত। তার সঙ্গে

ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহান্ত এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের আদর্শগত সংঘাতের দিকটি। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক দ্বন্দ্বের সহজ সমাধান তখনও প্রত্যক্ষগোচর হয়নি। অবশ্য অচিরেই শ্রীনিবাস আচার্যের দুশ্চিন্তা দূর হয়। চারদিক থেকে আসা অভূতপূর্ব সাড়া তাঁকে অভিভূত করেছিল। তিনি হয়তো মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ স্মরণ করে পরিতৃপ্ত মনে মহামহোৎসবের প্রস্তুতি তদারকিতে যোগদান করেছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এত বড়ো মহোৎসব ইতিপূর্বে আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয়নি। "নরোত্তম ঠাকুর সর্ব্বপ্রথম 'খেতুরি' গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও বৈষ্ণব-মহাধিবেশন হয় নাই।"[৪]

পানিহাটির দণ্ড-মহোৎসবের পর বৃহত্তর বঙ্গদেশের বৈষ্ণবসমাজে এমন সর্বব্যাপী মহোৎসবের আয়োজন আর হয়নি। গদাধর দাস, নরহরি সরকার এবং হরিদাস ঠাকুরের তিরোধান উৎসব খেতুরি মহোৎসবের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনটি তিরোধান উৎসবেই জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। ফলে সহজেই অন্তরালে থেকে সুবিশাল মহোৎসবের প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দান করেছিলেন জাহ্নবা দেবী। হাজার হাজার বৈষ্ণব বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খেতুরি মহোৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিমন্ত্রণ-পত্র বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচার করা হয়েছিল। সেই নিমন্ত্রণ পত্রের বয়ান হুবহু উদ্ধার করা না গেলেও, তার মর্মকথাটুকু উপস্থাপন করেছেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন:

> "আমরা সকলের নাম জানি না, জানা সম্ভবপরও নহে। যিনি এই উৎসবে যোগ দিয়া আমাদের উৎসব সফল করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনিই দয়া করিয়া আমাদের এখানে আসিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। রবাহূত ও আহূতের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা রাখিব না।"[৫]

এমন সর্বজনীন নিমন্ত্রণপত্র আর কোন উৎসবে হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। বৈষ্ণবদের উদারতা ও ব্যাপকতার মতোই এই উৎসব উদার এবং সর্বব্যাপী হয়ে ওঠার চেষ্টায় উন্মুখ ছিল। এই উৎসবে যোগদানের জন্য অদ্বৈত আচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দের সঙ্গে সমস্ত অদ্বৈত-শিষ্যেরা উপস্থিত হয়েছিলেন। জাহ্নবা দেবী খেতুরি উৎসবে যোগদানের পর বৃন্দাবন যাবেন— এই কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে বৈষ্ণবরা এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকেন।

> "বলিতে গেলে খেতুরির মহোৎসব এই মহামহিমান্বিতা রমণীরই ঐশ্বর্য্যের পরিচয়; তিনি যেখানে যেখানে যাইয়া বৈষ্ণবগণকে তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেখানকার লোক বিনাপত্তিতে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল।"[৬]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক যুদ্ধজয়ী বীরাঙ্গনার কাহিনি আমরা পড়েছি। কিন্তু জননীর স্নেহে প্রেমভক্তির রত্নসিংহাসন স্থাপনের এমন উদাহরণ কমই দেখা গেছে। খেতুরির মহোৎসবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উপস্থিতির কথাও জানা যায়। চৈতন্য-পত্নীর উপস্থিতি এই মহোৎসবের তাৎপর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই:

> "সেই শত সহস্র অভ্যাগতের মধ্যে একজনের উপর সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়াছিল। শতবর্ষবয়স্কা, অতি শীর্ণা, উপবাসকৃশা, তপঃপ্রভায় উজ্জ্বলকান্তি, বিশ্বজননীকল্পা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার স্বামীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য খেতুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।"[৭]

এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, বাঙালি জাতির প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল খেতুরিতে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈদ্য, কায়স্থ নির্বিশেষে সমাজের বৈষম্য-প্রাচীর ভেদ করে সকলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এই মহামহোৎসবে। রাজা সন্তোষ দত্ত সকল বৈষ্ণবের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন সেদিন। যে মন্দিরে ষড়বিগ্রহ স্থাপন করা হবে, সেই মন্দিরের সম্মুখের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মহা অধিবেশনের আয়োজন সম্পূর্ণ

করেছিলেন সেদিনে আয়োজকবৃন্দ। রাজা সন্তোষ দত্ত উপস্থিত সকলকে পরিধেয় বস্ত্র দান করে 'বরণ' করেছিলেন। মহান্তেরা হাসি মুখে সেই দান গ্রহণ করে, বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদের এই পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ কালীকান্ত বিশ্বাসের মতো লেখকের চোখে নেতিবাচক বলে মনে হয়েছে।

> "ডোর-কপিন-সর্ব্বস্ব বিষয়-বৈরাগ্যশালী প্রেমভক্তি-দাতৃগণের এই পট্টবস্ত্রগ্রহণ ও পরিধান বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধঃপতন বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি।"[৮]

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ। তিনি সম্ভবত খেতুরি মহোৎসবের সময় জীবিত ছিলেন না। তাঁর পরিবার ছিল গৌর-নাগরবাদী। এই তত্ত্বের বিশ্বাস তাঁরা ত্যাগ করলেন না। ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান করার ব্যাপারটিও ছাড়লেন না। বৃন্দাবনী তত্ত্বকে নরহরি সরকারের পরিবার তাই নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করে। সামাজিক প্রতিপত্তি, ধনবল থাকায় তাঁদের বিশেষ ঘাঁটাতে কেউ সাহস করেননি। 'হরিভক্তিবিলাস'-অনুসারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় অনাচারী, ভ্রষ্ট, অশ্রদ্ধেয়, অবৈষ্ণব হিসাবে বিবেচিত হল! ফলত, খেতুরি মহোৎসব বাংলার বৈষ্ণব সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবক্ষয়কে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করতে পারেনি। তথাপি যে প্রচেষ্টা সেদিন সেই মহাসম্মেলনের কর্তাব্যক্তিদের মাধ্যমে বৃহত্তর বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার মহত্ত্ব এবং গুরুত্ব কম ছিল না।

খেতুরি মহোৎসবের পরবর্তী সময়ে বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত প্রচারিত হতে লাগল। 'নবশায়ক' এবং 'অসৎ' শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিপীড়িত হত। ফলে তাঁদের অধিকাংশ লোক গোস্বামীদের শিষ্য হতে থাকেন। অনেক ব্যবসায়ী জাতির ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিল না। তাই তারা জাতে ওঠার জন্য গোস্বামীদের শরণাপন্ন হলেন। গোস্বামীরা তাঁদের পৌরোহিত্য করতে থাকেন। 'হরিভক্তিবিলাস' নামক বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ শূদ্রকে নারায়ণ (শালগ্রামশিলা) পূজা করার অধিকার দান করে। সমাজে এতদিন ধরে পতিত ও অন্ত্যজ হিসাবে যারা অবহেলিত, অপমানিত হয়ে এসেছে, তারা বৈষ্ণব ধর্মের ধারায় এসে সমাজের মূল স্রোতের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকল। অনেক মুসলমান এই সময়ে বৈষ্ণব হয়েছেন এবং 'জাতবোষ্টম' সমাজে মিশে গেছেন বলে গবেষকেরা অনুমান করেন। পতিত বা সমাজে নিম্ন বর্গের মানুষ গোস্বামীদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলে মন্ত্রদানকারী গোস্বামীরা সেই শিষ্যদের হাতে জল গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের বাড়িতে গিয়ে স্বপাক অন্ন গ্রহণ করতেন। "বীরভদ্র গোস্বামী বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের মধ্যে মালাচন্দন দ্বারা অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা করেন।"[৯]

নরোত্তম দাস বাংলার বৈষ্ণব সমাজে একটি বিপ্লবাত্মক কাজ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং কায়স্থ হলেও তাঁর অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। এই ব্রাহ্মণেরা তৎকালীন সমাজে পণ্ডিতের শিরোমণি ছিলেন। নরোত্তমের সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ শিষ্য হয়েছিলেন বলরাম মিশ্র। একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কায়স্থ নরোত্তমের শিষ্য হয়েছেন, এই সংবাদে ব্রাহ্মণসমাজে উত্তেজনা এবং তিরস্কারের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। সুপণ্ডিত ও ধনবান ব্রাহ্মণ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দেখেছেন রামকৃষ্ণ ও হরিনারায়ণ নামক আরও দুই ব্রাহ্মণকে। গঙ্গানারায়ণ শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাইলেন নরোত্তমের 'অশাস্ত্রীয়' কাজের বিরুদ্ধাচারণ করে। কিন্তু অচিরেই তিনি নরোত্তমের পরিকল্পিত 'ফাঁদে' পা দিলেন এবং অনুভব করলেন, বাঙালি জাতির উদ্ধারের এই অভিনব পথটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রভাবিত এবং পরাজিত গঙ্গানারায়ণ অচিরেই নরোত্তমের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সেকালের বিখ্যাত দস্যু চাঁদ রায় এবং তাঁর দলের ব্রাহ্মণ দস্যুদের অনেকেই নরোত্তমের শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন।

তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় নরোত্তম জীবন্ত বিপ্লব ছিলেন। পূর্বে নিত্যানন্দ পতিত জাতির মধ্যে বৈষ্ণব গোঁসাইদের পৌরোহিত্য প্রচলিত করেছিলেন বলে সমাজ তাঁকে একঘরে করার বন্দোবস্ত করেছিল। সেই নিত্যানন্দের হাতে বসুধা ও জাহ্নবাকে পরিণয়সূত্রে তুলে দেওয়ার জন্য জাহ্নবার পিতা সূর্যদাস সরখেলকে

ব্রাহ্মণসমাজ যথেষ্ট অপদস্থ করেছিল। যবন হরিদাসকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তাঁরা একথা বুঝেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ্যশাসিত বর্ণহিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করলে বিরোধ-সৃষ্টিকারীই সমাজে 'অচল' হয়ে যাবেন। নিত্যানন্দ বা অদ্বৈতের বংশধরেরা রীতিমতো অর্থব্যয় করে কুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমঝোতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নরোত্তম সমাজ-শাসনের রক্তচক্ষুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন ব্যক্তিত্বের প্রবলতায়:

> "নরোত্তম সমাজের কাছে একটুও অবনতি স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ বৈষ্ণবেরা জনসাধারণের এক বিশাল সভা আহ্বান করিয়া নরোত্তমকে খাঁটী ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র দান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র।"[১০]

সম্ভবত খেতুরি মহোৎসবের প্রাঙ্গণ থেকেই রাগ সংগীতের ধারায় কীর্তন-গানের পুনর্বিন্যাস সংঘটিত হয়েছিল। নরোত্তম দাসের বিশেষ জ্ঞান ছিল সংগীত-প্রকরণের ওপর। উত্তর-মধ্য ভারতের সংগীতের ধ্রুপদ-বৈচিত্র্য এবং নতুন আগত খেয়ালের সঙ্গে তাঁর ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই পরিচয় ঘটেছিল।

কৃৎ ধাতুর অর্থ প্রশংসা। 'কীর্তি' ও 'কীর্তন' এই দুটি শব্দই 'কৃৎ' ধাতু থেকে এসেছে। 'রূপে শৌর্যে, জ্ঞানে ও কর্মে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহার নাম স্মরণ, গুণ বর্ণন, যশোসূচক গানের নাম কীর্তন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পরম গুণান্বিত। তিনি পরমানন্দস্বরূপ, সকলের আশ্রয়। তাঁহার মহিমা অনুত্তর। তাই ঈশ্বরের নাম, গুণ ও যশোকথা আবৃত্তি ও গান কীর্তনের বিশিষ্ট অর্থ।'[১১]

ভাগবতের 'স্মরণং কীর্তনং বিষ্ণো' শ্লোকাংশে 'কীর্তন শব্দের উল্লেখ রয়েছে। পূর্ব ভারতে প্রাপ্ত অষ্টম শতকের একটি মূর্তির তলায় খোদিত 'শঙ্কর কীর্তন' শব্দবন্ধে 'কীর্তন' শব্দের উল্লেখ আমাদের আশ্চর্য করে। এটিই সম্ভবত কীর্তন শব্দের উল্লেখযুক্ত প্রাচীন ভাস্কর্য। বাংলায় ঔড্র-মাগধী নৃত্যের বৃত্তি বা স্টাইলের নাম ভারতী ও কৈশিকী। গৌড়ীয় কীর্তনের নৃত্যে ভারতী ও কৈশিকী বৃত্তি অর্থাৎ কথোপকথন সহযোগে উচ্চণ্ড ও লাস্য বা মধুর নৃত্যের প্রভাব পড়েছে।[১২]

নরহরি চক্রবর্তী তাঁর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, ষড়ঙ্গ প্রবন্ধ গানই কীর্তন। অঙ্গ ছয়টি হল—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট এবং তাল।

> "ষড়ঙ্গ প্রবন্ধ গীত সর্ব্বত্র প্রচার।।
> স্বর বিরুদ পদ তেনক পাঠ তাল।
> এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল।।"[১৩]

রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা এবং মহাপ্রভুর বর্ণনামূলক পদাবলি এক বিশেষ সুরে ও তালে আখর যোজনাসহ গাইবার যে রীতি তার সঙ্গে নৃত্য সংযুক্ত হয়ে কীর্তন-নৃত্যের রূপ ধারণ করেছে। 'সুরে, তালে, করতাল এবং মৃদঙ্গ সহযোগে ভগবানের নাম অর্থাৎ কীর্তি-গান-আবৃত্তি অর্থে 'কীর্তন' শব্দের ব্যাপক প্রচলন ও প্রসার হয়েছে চৈতন্যদেবের সময় থেকে।'[১৪] শ্রীচৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবর্তীযুগে কীর্তনগানের সুপ্রতিষ্ঠা বিশেষ অভিনিবেশের দাবি রাখে। যাঁরা এই সময়ে এমন অভিনব সংগীত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, তাঁরা যে প্রতিভাসম্পন্ন সুর-রসিক ছিলেন, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীনকাল থেকে কীর্তনগানে খোল-করতাল ছাড়া অন্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের রীতি ছিল না।[১৫] গায়ককে নির্ভর করতে হত নিজের কণ্ঠস্বরের ওপর। উচ্চাঙ্গের কীর্তনসংগীতে এখনও সেই প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতি ও গায়েন রীতি চলে আসছে। নিজ কণ্ঠস্বরকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতার ফলে মানুষের কণ্ঠ যতদূর মধুরতা তুলে ধরতে সক্ষম, তাঁরা তার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ

করতে সক্ষম হয়েছেন। মহাপ্রভু এবং তাঁর পরিকরেরা ঈশ্বরপ্রেমের ভাবময়তাকে নৃত্য, গীতের মধ্য দিয়ে কীর্তন রূপে প্রকাশ করেছেন বারবার:

> "...নব্য দেশীয় রীতির কীর্তনগানকে বাঙলা ভাষায় নামকীর্তনের মধ্য দিয়ে প্রসারিত করলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি শুধু উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণই করেননি, কৃষ্ণের বিভিন্ন নামকে সাজিয়ে তাতে সুরসংযোগও করেছিলেন। খোল-মন্দিরা সহযোগে এবং সহায়কদের মিলিত কণ্ঠে গীত এই নাম-কীর্তনকে বলা হয়েছিল সংকীর্তন। চৈতন্য-জীবনের ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে মহাপ্রভুকেই সংকীর্তনের জন্মদাতা বলেছেন।"[১৬]

কীর্তনে গীত পদাবলিগুলিতে উৎকৃষ্ট কবিত্বের সমাবেশ ঘটে। কাব্য এবং সংগীত এখানে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। বাঙালির কীর্তনে কথা ও সুরের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে। কীর্তনে যে রসসৃষ্টির চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিকতা রয়েছে তার মূলে। 'ভারতীয় সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা ভগবান স্বয়ং। কীর্ত্তনে আরও বিশেষভাবে দেখিতে পাই যে ভগবানের লীলা-খেলা, ভগবৎ-প্রসঙ্গ লইয়াই এই সঙ্গীত গঠিত। সেই জন্যই 'কানু ছাড়া গীত নাই' এ গৌরব কেবল বাংলাদেশেরই।'[১৭]

কীর্তনের কথা ভাবকে প্রকাশ করে। তাই সুর এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ব্যাহত না হয়। কথা এবং সুর পরস্পরের সহযোগী হয়ে উঠলে ভাব যথাযথভাবে প্রকাশিত হতে পারে। কীর্তন-গায়কদের তাই প্রধান চেষ্টা থাকে মহাজন-পদাবলির অন্তর্নিহিত ভাবকে ফুটিয়ে তোলার দিকে। ভাব গম্ভীর এবং ভাষা জটিল হতে পারে। তখন গায়ক আখর যোগ করে বা আরও বিভিন্ন কৌশলে তাকে সুবোধ্য করে তুলতে সচেষ্ট হন। এই সুযোগে তিনি তাঁর নিজস্ব কবিত্বশক্তি, রস ও সুরের জ্ঞান কতখানি তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে পারেন। আখর যোগ করার ভেতর দিয়েও একেক জন কীর্তনিয়ার নিজস্ব মুন্সিয়ানার প্রকাশ পায়। আখরের একটি অসাধারণ বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেছেন মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী:

> "আখরের মাধ্যমে সম্মোহন সৃষ্টি হয়। শোনা যায়, রাধিকা সরকার বৃন্দাবনে হোরি গান গাইতে আখর দিচ্ছিলেন—"ঐ যায়", "হারুয়া নাগর ঐ যায়", "যেতে যেতে আবার ফিরে চায়"। বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বার বার 'ঐ যায়' আখর সংযুক্ত করার সঙ্গে শ্রোতারা সব উঠে ওইদিকে চললেন, চললেন গায়ক নিজেও।"[১৮]

কীর্তনের মধ্যে হিন্দু বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিধৃত রয়েছে। প্রধানত গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারাকে পরিপুষ্টি দান করেছিল এই কীর্তন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ কীর্তনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ফলে সাধারণ মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ ও ঐক্যবোধের উন্মেষের মন্ত্র এসেছিল কীর্তনের পথ ও শপথ থেকে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর বাঙালিকে মানবতার ছত্রছায়ায় একত্র করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শিক্ষাষ্টক শ্লোকে মহাপ্রভুর লক্ষ্য ও আদর্শ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে:

> "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়াঃ সদা হরিঃ।।"[১৯]

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্রে রেখে বাংলাদেশে ভক্তিবাদের স্রোত বহমান হয়েছিল। কীর্তন সেই ভক্তির ক্ষেত্রে সাধনার অন্যতম পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল অনায়াসে।

> "চৈতন্যদেবের নামে ও চৈতন্যপন্থার গুণে বাঙ্গালী সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ভক্তিবাদের আশ্রয় নিয়াছিল। চৈতন্যপন্থায় কীর্তন ভক্তিসাধন। বহুজনে মিলিয়া ঈশ্বরের নামগুণযশোগান করিয়া সঙ্কীর্তন করিত। সঙ্কীর্তন নানান মতাবলম্বী লোকের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল।"[২০]

প্রেমভক্তির অনুভবের সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্যের সম্পর্ক চিরকালীন। চৈতন্যদেবের হৃদয়ে প্রেমভক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে কীর্তনগান এবং নাচের মধ্য দিয়ে সেই প্রেমের প্রকাশ অনবদ্য এবং অনিবার্য রূপে দেখা দিয়েছিল। চৈতন্য-পরিকরদের স্বভাবের মধ্যে মহাপ্রভুর ভাবের সঞ্চার ঘটতে বিলম্ব হয়নি। 'মহাপ্রভু এবং তাঁর নবদ্বীপ-নীলাচল পরিকরদের ভাবমুহূর্তগুলি অনিবার্যভাবে নৃত্যে, গীতে এবং নানাবিধ দৈহিক বিকারের মধ্য দিয়ে মূর্তিমান হতে চেয়েছিল। গীতে এর প্রকাশকে 'কীর্তন' নামে অভিহিত করা হয়েছে।'[২১]

মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের পরে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে মতের পার্থক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাঁরা সকলেই চৈতন্যদেবের নামে কীর্তন এবং ভক্তিবাদ প্রচারে তৎপর ছিলেন। তথাপি আশ্চর্যভাবে তাঁদের মধ্যে ঐক্যের অভাব দেখা দিয়েছিল। বড় বড় মহান্তেরা নিজেদের ভাব অনুসারে 'চৈতন্যপন্থী ভক্তিবাদ'-এর আলাদা আলাদা গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। পণ্ডিতপ্রবর নরোত্তমদাস মহাপ্রভুর তিরোধানের অর্ধশতাব্দী পরে এই গোষ্ঠীসমূহকে এক সূত্রে গ্রন্থনের প্রাণান্ত প্রয়াস করেছিলেন। ফলত, গৌরপারম্যবাদ, গোস্বামীসিদ্ধান্ত এবং গুহ্যসাধন পন্থার মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করে যে ধর্মমত সুগঠিত হয়, তা মেনে নেন সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষেরা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি এই সামঞ্জস্যের ভিতের ওপর গড়ে উঠেছে।

কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের কালে কীর্তনের একটি ঐতিহ্য ছিল বঙ্গদেশে। পদকর্তা বিদ্যাপতি এই ধারায় পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সুদক্ষ কারিগর। উনিশ শতকে চৈতন্য-ধর্মান্দোলন সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক বারুণি ভাটিয়ার মন্তব্য এ-সূত্রে উল্লেখ্য:

> In Bengali Vaishnavism, the "manifestation" of devotion is through the performance, quite literally, of kirtan. The history of kirtan in Bengal is traced by scholars and practioners from Jayadeva's Gitagovinda, a twelfth-century Sanskrit lyric glorifying the love-play of Radha and Krishna. The thirteenth century Maithili poet Vidyapati was the next illustrious figure in the history of Bengali kirtan, followed by Badu Chandidas from the fourteenth century. By the time of Chaitanya, kirtan was already a well-developed genre of devotional performance in Bengal, with established rules of form and music. Subgenres of kirtan, such as padakirtan and palakirtan, had already been put in place, and a mature musical tradition grew up around its performance.[২২]

মহাপ্রভুর পূর্বে গুহ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কীর্তন-গানের বেশ চল ছিল। সেই কীর্তনে সমাজের অস্পৃশ্য প্রান্তিক মানুষ-জনেদের অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল। চৈতন্যদেবের পূর্বে কীর্তন সর্বজনীনতার পথে অনেক দূর যাত্রা করছিল। তথাপি চৈতন্য-প্রবর্তিত কীর্তন সমাজে অভিনব রূপে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পেরেছিল। গুহ্য সম্প্রদায়ের কীর্তন বা যাবতীয় ধর্মাচরণ গোপনে সংঘটিত হতো। কিন্তু চৈতন্যদেবের কীর্তন অনুষ্ঠিত হতো সর্বসমক্ষে, প্রকাশ্যে। আচণ্ডালের সেই মহামিলনক্ষেত্রে গানের সঙ্গে ভাবাবেশে নৃত্য ইতিপূর্বে সম্ভবত দেখা যায়নি:

> "চৈতন্য যে ভাবে গানকে ভক্তি-প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছিলেন, তার কোনও সমান্তর বঙ্গে ছিল না। নাম এবং নগরকীর্তনের কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করা হত। এই কীর্তনের কোন কাহিনীমূলক ভিত্তি ছিল না, কোনও বিশেষ বিদগ্ধতাও ছিল না। তাতে কোনও বুদ্ধির, যুক্তির প্রকাশ ছিল না। তার কোনও সুসংস্কৃত নন্দনতত্ত্ব ছিল না। ভক্তির দুর্নিবার প্রক্ষোভে কীর্তন গায়কগণ, শ্রোতাগণ হেসেছেন, কেঁদেছেন,

নেচেছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েছেন ...সরলতা এবং ভাবের গভীরতাই ছিল এইরূপ কীর্তনের মৌল বৈশিষ্ট্য।"[২৩]

শ্রীচৈতন্য নামকীর্তন এবং খোল-করতাল সহযোগে সম্মিলিত কীর্তনের উদ্ভব ও প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন। তবে এই সময়ে কীর্তনের সুর-তালের বৈচিত্র্য কেমন ছিল, আখরের ব্যবহার ছিল কিনা, লীলাকীর্তনের মতো রসপর্যায়ের বিভাগ ছিল কিনা প্রাপ্ত তথ্যাদি যথেষ্ট না হওয়ায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত টানা কঠিন। কীর্তনগানের বিকাশের পূর্ণ বিকাশের প্রথম পরিচয় মেলে খেতুরি মহোৎসবে। সেই সংকীর্তনের অপূর্বতার গুণে মহাপ্রভুও যেন সপারিষদ উপস্থিত হয়েছিলেন ভাবোন্মাদ বেশে:

"সকল মহান্ত শ্রীল নরোত্তম প্রতি।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিতে কৈলা অনুমতি।।
তবে নরোত্তম সবে করি প্রণিপাত।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভিলা হৈয়া উল্লাসিত।...
নরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি অতি সুমধুরে।
আকর্ষিলা গোরাচাঁদে রহিতে না পারে।।
মহাভক্ত নরোত্তমের ভক্তির প্রভাবে।
গণসহ গৌররায় হৈলা আবির্ভাবে।।"[২৪]

'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায়, মহোৎসব শুরুর পূর্বে তথা পঞ্চবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আগের দিন খোল-করতালের পূজা করা হয়েছিল। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হলে কীর্তন আরম্ভ করা হয়েছিল। গোকুল দাস, নরোত্তম দাস গান গেয়েছিলেন, আর দেবী দাস, গৌরাঙ্গ দাস বাজিয়েছিলেন খোল-করতাল। খেতুরি মহোৎসবের অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল কীর্তন এবং সংকীর্তনের সর্বজনস্বীকৃতি। অচিরেই তা খেতুরি অঞ্চলে বাৎসরিক উৎসবের রূপ নিয়েছিল। কীর্তনের মুখ্য বিভাগগুলির পরিচয় সর্বজনমান্যতা লাভ করেছিল খেতুরি মহোৎসবের প্রাঙ্গণ থেকেই:

"নরোত্তম প্রবর্তিত গড়েরহাটের গড়ানহাটি, জ্ঞানদাসের বাসভূমি মনোহরশাহ পরগনার মনোহরশাহী, হুগলির নিকটবর্তী বর্ধমানের রানিহাট অঞ্চলের রেনেটি এবং বাঁকুড়া-মেদিনীপুর সংলগ্ন অঞ্চলের মান্দারন পরগনার মান্দারিনী—এই গীতমহোৎসবের মূল্যবান সুফল। এই সময় থেকেই সম্ভবতঃ শ্রীরূপ-প্রবর্তিত রসপর্যায়ের অনুসরণে পালাবদ্ধ গীত গাওয়ার পদ্ধতিও স্থিরভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এবং 'আখর' দেওয়ার চমৎকারিতাও প্রদর্শিত হয়। তবে একথা ঠিক যে এসব বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য পূর্ব থেকেই অল্পবিস্তর প্রচলিত না থাকলে কেবল একটা অনুষ্ঠানেই প্রারব্ধ হওয়ার কথা নয়।"[২৫]

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস প্রমুখের হাত ধরে কীর্তনের নিজস্ব শৈলী অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি ধারায় পরিণত হয়েছিল। রাগ এবং তাল কীর্তনের মধ্যে সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল শ্রোতার হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ যাতে যথাযথভাবে সংঘটিত করা সম্ভব হয়। এই একই শৈলীর দেখা মেলে বৃন্দাবন এবং রাজস্থানের বল্লভ সম্প্রদায়ের মধ্যে। বাংলায় এই কীর্তনের ধারা ক্রমে সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়ে পদাবলি কীর্তন বা লীলাকীর্তনে পরিণতি লাভ করে। লীলাকীর্তনে গাওয়া হতো মিলনের গান (সম্ভোগ) এবং বিরহের গান (বিপ্রলম্ভ)। এখানে নায়ক-নায়িকার প্রেমের আবেগ স্তরে স্তরে প্রকাশিত হত।

কীর্তনের গায়কী ধারার রূপান্তর ঘটে মনোহরশাহী, রেনেটি এবং ঢপ গায়কী শৈলীর বিকাশের মাধ্যমে। উত্তর ভারতের হাভেলি (haveli) গায়কী রীতির চেয়েও বাংলার এই ধারাসমূহ ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ে

গঠনবিন্যাস এবং শৈলীর দিক থেকে। তাছাড়া বাংলার কীর্তন পরিবেশনার বাহ্যিক রূপটি ছিল খোলা জায়গা বা গাছতলা অথবা কোন আখড়ায় একসঙ্গে বেশ কয়েকজন মিলে গান গাওয়া। ঘর বা মন্দিরে বসে বৈঠকি ধাঁচে কীর্তন পরিবেশনা সেকালের বাংলা ও বাঙালির প্রিয় রূপ ছিল না। অবশ্য অষ্টাদশ শতকে রূপচাঁদ চাটুজ্যে (১৭২২-১৭৯২) মনোহরশাহী শৈলীকে আরও সহজ সরল করে জনপ্রিয় ঢপ কীর্তন সৃষ্টি করেন। এই শৈলীর উদ্ভব এবং যাত্রা-থিয়েটারে কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের কাহিনির আধিপত্যের ফলে কীর্তন ভক্তির জায়গা থেকে ক্রমশ সরে এসে চূড়ান্তভাবে বিনোদনের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে শ্রীখণ্ড ছিল কীর্তন প্রচারের মূলকেন্দ্র। সরকার ঠাকুর, রঘুনন্দন আচার্য, লোচনদাস, কাঁদড়ার জ্ঞানদাস, যাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, কাটোয়ার গদাধর দাস শ্রীখণ্ডের কীর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর অন্যতম অন্তরঙ্গ সঙ্গী বাসুদেব ঘোষ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর ভাই মাধব ঘোষ কীর্তনিয়া হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত সুমার্জিতকণ্ঠ, উচ্চ সপ্তকের গানে পারদর্শী। কোনোদিন তাঁর কণ্ঠ বিকৃত হয়নি কীর্তন গাওয়ার সময়। 'চৈতন্যভাগবত'-এর খ্যাতনামা রচয়িতা বৃন্দাবন দাস তাঁর মূল্যবান চৈতন্যজীবনী গ্রন্থটির পাশাপাশি 'তত্ত্ববিলাস', 'দধিখণ্ড', 'বৈষ্ণব বন্দনা', 'ভক্তিচিন্তামণি', 'নিত্যানন্দ বংশমালা' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আর লিখেছিলেন বেশ কিছু কীর্তনের পদ। বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক পদকর্তা বলরাম দাস ছিলেন নিত্যানন্দের বিশেষ অনুগত। তাঁর লেখা অনেক পদ সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত কীর্তনিয়াদের মুখে মুখে প্রচলিত। যেমন রাস পর্যায়ের 'গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া, অখিল ভুবনপতি বিহরে নদীয়া' পদটি প্রসিদ্ধ মধ্যম দশকোশী তালের গান। গরাণহাটি কীর্তনের গান হিসাবেও এটি প্রচলিত।

খেতুরি মহোৎসবের তাৎপর্য নানা দিক থেকে বিচার্য। এই সম্মেলনের মাধ্যমে একদিকে যেমন বৃন্দাবন এবং বঙ্গদেশের বৈষ্ণবতা ঘিরে কেন্দ্র-প্রাদেশিক দ্বন্দ্ব যথাসম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল, তেমনি বঙ্গদেশেও বৈষ্ণব শাখা ও উপ সম্প্রদায়সমূহের ভেতরকার বিরোধ-বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটানোর প্রয়াস শুরু হয়। বিশেষত, নিত্যানন্দ-জাহ্নবা বীরভদ্রের আতিশয্যে সহজিয়া বৈষ্ণবদের দলে টানার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, দেহ-সাধনার সেই 'ভ্রষ্টাচার' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না। 'সকল পুরুষই কৃষ্ণ, সব নারীই রাধা'— সহজিয়া পন্থার এই দর্শন যাতে মূল ধারার বৈষ্ণবতায় আর প্রশ্রয় না পেতে পারে, সেই লক্ষ্যে লীলাকীর্তনের প্রত্যেক পর্যায়ের সূচনায় 'গৌরচন্দ্রিকা' গাওয়ার রীতি খেতুরি সম্মেলনেই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এতে উপস্থিত ভক্ত-শ্রোতৃমণ্ডলী নিশ্চয়ই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অলৌকিক, অপার্থিব, ঐশ্বরিক ব্যাপার বলে অনুভব করবেন, এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই ছিল সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের। অধিকন্তু, এই খেতুরি মহোৎসব থেকেই কীর্তনের গরানহাটি ধারার সূচনা হয়, যা বাংলা কীর্তনকে দীর্ঘদিনের লোকায়ত ধারা থেকে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সংগীতের অভিজাত ধারায় উন্নীত করে। বৈষ্ণব-কীর্তনের এ ধারা বেশিদিন স্থায়ী না হলেও উত্তরভারতীয় হিন্দুস্থানি সংগীতের সঙ্গে বাংলা কীর্তনের সংমিশ্রণ পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরী ঘরানার সঙ্গে মিশে বঙ্গের রাগসংগীতকে বহুভাবে যে সমৃদ্ধ করেছিল, সে কথাও অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। *গৌরাঙ্গ-পরিজন*। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৫, পৃ. ৪৩৫।

২. চক্রবর্তী, নরহরি। *ভক্তিরত্নাকর*। মিশ্র, রামদেব প্রকাশিত, মুর্শিদাবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১২, পৃ. ৬২৬।

৩. পূর্বোক্ত, ১৯১২, পৃ. ৬২৭।

৪. বিশ্বাস, কালীকান্ত, 'বৈষ্ণব মহাধিবেশন'। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। সরকার, পঞ্চানন সম্পাদিত, ১৩১৪, ৪র্থ সংখ্যা, ২য় ভাগ, পৃ. ১৬৭।

৫. সেন, দীনেশচন্দ্র। *বৃহৎ বঙ্গ*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪১, পৃ. ৭৫৮।

৬. বিশ্বাস, কালীকান্ত, 'বৈষ্ণব মহাধিবেশন'। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। সরকার, পঞ্চানন সম্পাদিত, ১৩১৪, ৪র্থ সংখ্যা, ২য় ভাগ, পৃ. ১৬৯।

৭. সেন, দীনেশচন্দ্র। *বৃহৎ বঙ্গ*। দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪১, পৃ. ৭৫৮।

৮. বিশ্বাস, কালীকান্ত, 'বৈষ্ণব মহাধিবেশন'। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। সরকার, পঞ্চানন সম্পাদিত, ১৩১৪, ৪র্থ সংখ্যা, ২য় ভাগ, পৃ. ১৭২।

৯. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ। *বাঙ্গলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)*। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃ. ৮১।

১০. সেন, দীনেশচন্দ্র। *বৃহৎ বঙ্গ*। দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪১, পৃ. ৭৬৩।

১১. সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ১৬।

১২. মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *গৌড়ীয় নৃত্য*। দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১২০-১২১।

১৩. চক্রবর্তী, নরহরি। *ভক্তিরত্নাকর*। রাধারমণযন্ত্র, মুর্শিদাবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪২৬ চৈতন্যাব্দ, পৃ. ৩৬৯।

১৪. মুখোপাধ্যায়, মহুয়া। *গৌড়ীয় নৃত্য*। দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১২০।

১৫. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *কীর্ত্তন-গীতি-প্রবেশিকা*। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৮, নিবেদন, পৃ. ৩।

১৬. দাস, ক্ষুদিরাম। *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*। উবুদশ, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ৩১০-৩১১।

১৭. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *কীর্ত্তন-গীতি-প্রবেশিকা*। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৮, নিবেদন, পৃ. ৪।

১৮. চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর। *বাংলার কীর্তন গান*। সাহিত্যলোক, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০২৩, পৃ. ৫৫।

১৯. গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*। আদিলীলা, প্রভুপাদ সম্পাদিত, ভক্তিবেদান্ত বুকট্রাস্ট, মায়াপুর, সপ্তম সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ৯০৩।

২০. সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ১৩।

২১. দাস, ক্ষুদিরাম। *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*। উবুদশ, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ৩১০।

২২. Bhatia, Varuni. *Unforgetting Chaitanya*. Oxford University press, America, 1975, p. 77.

২৩. চক্রবর্তী, রমাকান্ত। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৫।

২৪. দাস, নিত্যানন্দ। *প্রেমবিলাস*। তালুকদার, যশোদালাল প্রকাশিত, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩২০, পৃ. ১৮১।

২৫. দাস, ক্ষুদিরাম। *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*। উবুদশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ৩১২-৩১৩।